হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর কবুলিয়্যাতে দোয়ার স্মরণীয় একটি ঘটনা

মাওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্

হযরত সায়্যেদ গুলাম হুসেয়ন শাহ সাহেব (রা.) শাহপুর জেলার, ভেরা নিবাসী সাহাবী ছিলেন। তিনি ১৮৯৬ সনে লাহোরের ভেটেরনারী কলেজে ভর্তি হবার সূযোগ পান। সেখানে ভর্তি হবার পর কলেজের ছাত্র এবং প্রফেসার তার ঘোর বিরোধী হয়ে উঠে। সে সময় আল্লাহ তা'লা তাঁর সাহায্য ও সমর্থনে এক জোড়ালো নিদর্শন প্রদর্শন করেন।

হযরত সায়্যেদ গুলাম হুসেয়ন শাহ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন–

সব প্রফেসার আমার ঘোর বিরোধী হয়ে উঠে। এক সপ্তাহে যা পড়ানো হতো প্রত্যেক সোমবার সে অংশের পরীক্ষা হতো। প্রফেসরদের মধ্যে এক প্রফেসার তো এত ভয়ঙ্কর ছিল, সে শুধু একটাই প্রশ্ন করতো, তুই কি মির্যার মুরিদ? আমি উত্তর দিতাম, হ্যাঁ। এরপর সে আমার নামের পাশে প্রাপ্ত নম্বর শূন্য লিখে দিত। প্রতিদিন নুতন নুতন পদ্ধতিতে কষ্ট প্রদান ও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জন্য অবমাননাকর কথা-বার্তা শুনে আমি কলেজ ছেড়ে দিতে মনস্থ করলাম। ঐ দিনগুলিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) একটি বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে ছিলেন, তাতে লেখা ছিল; আমার জামা'তকে আমি যে রাস্তায় পরিচালিত করতে চাই সেই রাস্তায় কাঁটা ও কন্টকবিশিষ্ট গাছ পালা আছে। যার পা' কোমল সে যেন এখন-ই আমার থেকে পৃথক হয়ে যায়। সূতরাং এ লেখা পড়ে, আমি ভীত হয়ে পড়ি এবং নিরবতা অবলম্বন করি। তবে আমি আমার পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে হুযুর (আ.) কে লিখে জানাই। তিনি (আ.) উত্তর দিলেন, আপনি আপনার পড়া-লেখা চালিয়ে যান। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করবো।

কলেজে, আমি অস্পৃশ্যের মত একা নি:সঙ্গ মনখারাপ করে বসে থাকতাম। কেননা, কলেজে প্রফেসারগণ আমার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং ছাত্ররা দাঁত বের করে হাসতো। আমি মনকষ্টে ছিলাম তবে হুযুর (আ.) এর দোয়ার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল।

দু' বছরের কোর্স ছিল। পাঁচটি বিষয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারকারীর জন্য পুরস্কার দেয়া হতো। এ ছাড়া সার্জারী ও মেডিসিন এ প্রথম স্থান অধিকারকারীকে রুপার দু'টি মেডেল দেয়া হতো এবং কলেজে প্রথম স্থান অধিকারকারীকে স্বর্ণের মেডেল দেয়া হতো। পরীক্ষা সন্নিকটে ছিল, ভালো ছাত্ররা নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী এসব মেডেল পাওয়ার কথা বলতো। আর অন্যদিকে, আমি দু:খিত ও চিন্তিত অবস্থায় একা বসে বসে দোয়া করতাম; হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দাও।

ফাইনাল পরীক্ষায়, ভেটেরনারী বিভাগের একজন উর্ধ্বতন ইংরেজ কর্মকর্তা, যে খুব ভালো উর্দু জানতো,পরীক্ষক হিসাবে আসেন। তার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রফেসর বসতো এবং পরীক্ষক ইংরেজিতে প্রশ্ন করতো আর তিনি উর্দুতে অনুবাদ করে ছাত্রদের বলে দিতেন। প্রয়োজনে ছাত্রদের উত্তর ইংরেজিতে অনুবাদ করে পরীক্ষককে বলে দিতেন। পরীক্ষক কেবল একটিই প্রশ্ন করছিলেন, যার উত্তর না তো বইয়ে ছিল আর না-ই কোন প্রফেসর সে বিষয়ে আমাদের বলেছে। প্রশ্নটি ছিল, periodic epithelia-তে আক্রান্ত ঘোড়াকে আমরা কিভাবে চিনবো। আমার পূর্বে কয়েকজন ছাত্রকে সেই পরীক্ষক এ প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর না পাওয়ায় ফেল নম্বর দিয়েছিলেন। আমাকে এই প্রশ্নটি করলে, আমি ঘাবড়ে গেলাম। তবে মনে হলো, এটি তো চোখের রোগ তাই কিছু তো বলতেই হবে। সূতরাং আমি আমার এক চোখ একটু সঙ্কুচিত করলাম এবং আমার কিছু বলার আগে পরীক্ষক নিজ চেয়ার হতে লাফিয়ে উঠলো আর আমার প্রফেসরকে বলতে লাগল, দেখ! ঘোড়ার চোখ এমনটিই হয়ে যায় যেমনটি এই ছেলেটি করে দেখিয়েছে। পরীক্ষক আমাকে পুণরায় করে দেখাতে বললে, আমি করে দেখাই এবং তিনি আমাকে পূর্ণ নম্বর দেন। এর ফলে আমি এ বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করি এবং আমাকে পুরস্কার ও মেডেলের প্রাপ্য বলে ঘোষনা দেন।

লিখিত পরীক্ষা শুরু হলে, আল্লাহ তা'লার এক অদ্ভূত কুদরত আমি প্রত্যক্ষ করি। একটি বইয়ের হাজার পৃষ্ঠা হতে মাত্র তিন চারটি প্রশ্ন খুব ভালো করে পড়ে

থাকলেও, প্রশ্নপত্রে সেগুলোই এসেছে। আমি প্রশ্নের উত্তর খুব ভালোভাবে দিলাম। আর এ অবস্থা শুধু মাত্র যে একটি বিষয়ে হয়েছে তা নয় পাঁচটি বিষয়েই তা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'লার ফযলে ইংরেজ পরীক্ষক আমাকে পাঁচটি বিষয়েই প্রথম স্থান প্রদান করে। ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলে আমি সব বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করি এবং কলেজেও প্রথম স্থান লাভ করি। ফল প্রকাশ হলে, কলেজে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারনা হয় যে, কাদিয়ানী মির্যা-ই প্রথম স্থান অর্জন করেছে। কলেজে যেন শোকের ছায়া নেমে আসে। অপরদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীও বিরোধী প্রফেসরদের জন্য অবধারিত অপমানের আরো কিছু বাধা ছিল। তারা একটি প্রতিনিধি দল বানিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষক ইনচার্জের কক্ষে যায় এবং বলে, এ ছেলেটি অত্যন্ত অযোগ্য। সাপ্তাহিক পরীক্ষাতে সে কখনোই পাশ করে নাই আর একে প্রতিটি বিষয়ে প্রথম করা হয়েছে, তাতে ভুল হয়েছে। হয়তো কোন কাকতালীয় ঘটনা ঘটেছে। তাই তার পরীক্ষা আবার নেয়া হোক। এতে সেই ইংরেজ পরীক্ষক রেজাল্ট শীট টেবিলে রেখে বললো, এ ছেলেটি যখন প্রতিটি বিষয়ে প্রথম হয়েছে তখন এটি কোন কাকতালীয় বিষয় নয়।

দু' একটি বিষয়ে যদি প্রথম হতো তবে বলা যেতো সে আকস্মিকভাবে প্রথম হয়েছে। এতে প্রফেসাররা আবার বললো, এ তো অত্যন্ত অযোগ্য, আপনি এর পরীক্ষা নিয়ে দেখেন প্রমাণ হয়ে যাবে। এতে সেই ইংরেজ পরীক্ষক বলে উঠলো, আমি এখানে ছাত্রদের সাথে অন্যায় করতে আসি নাই। আমি পরীক্ষা নিতে এসেছি এবং পরীক্ষা নিয়েছি। এরপর ধমকের সুরে বললো, তোমরা এখনই আমার অফিস থেকে বেরিয়ে যাও, আমার সময় নষ্ট করো না। বিরোধীরা এভাবে অপমানিত হয়ে ও বিফল মনোরথে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো।

পরবর্তিতে পাঞ্জাবের লেফটেনেন্ট গভর্নর আমাদের কলেজে এসে পুরস্কার বিতরন করেন। সব পুরস্কার নিয়ে আমি যখন আমার প্রফেসরদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম, হিংসায় তারা যেন মরে যাচ্ছিল। কয়েকজন বলতে লাগলো, তুমি এটিকে তোমার মির্জা-র 'মুজেযা' বলে মনে করো না। আমি বললাম, মুজেযার মাথায় তো কোন শিং হয় না। এটি যদি 'মুজেযা' না হয় তবে মুজেযা কাকে বলে? এটি অবশ্যই 'মুজেযা'। আর তা সংঘটিত হয়েছে আপনাদের চোখের সামনে। আপনাদের কলেজে এবং আপনাদের হাত দিয়ে। এরপরও আপনারা যদি না মানেন তবে আমার কাছে এর কোন চিকিৎসা নেই। এরপর আমি আমার সব পুরস্কার নিয়ে কাদিয়ানে আসি এবং পুরস্কার সমূহ ও কিছু নগদ অর্থ নজরানারূপে হুযুর (আ.) এর সামনে পেশ করি। হুযুর (আ.) পুরস্কারগুলো দেখে অনেক আনন্দিত হন এবং আমার জন্য দোয়া করেন।

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশ্‌তা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।" ('নূরুল হক', খণ্ড ১, পৃ. ৫)